

প্রবাস বন্ধু

সৈয়দ মুজতবা আলী

[লেখক-পরিচিতি : সৈয়দ মুজতবা আলী ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে আসামভুক্ত শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সিকান্দর আলী। সৈয়দ মুজতবা আলীর পৈতৃক নিবাস মৌলভীবাজারে। তিনি সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ও শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন। পরে ১৯২৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। আফগানিস্তানে কাবুলের কৃষি বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মিশরের আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহীশূরের বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়। ১৯৬১ সালে তিনি বিশ্বভারতীর রিডার নিযুক্ত হন। সৈয়দ মুজতবা আলী নিজস্ব এক গদ্যশৈলীর নির্মাতা। বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে তিনি যে গদ্য রচনা করেছেন, তা খুবই রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো : দেশে-বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম ইত্যাদি। তিনি ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম। অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসি। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে- জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।’ অর্থাৎ ইনি ‘হরফন-মৌলা’ বা ‘সকল কাজের কাজি’।

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো-না-কোনো মস্তীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। ‘ওরভোয়া, বিকেলে দেখা হবে’ বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম ছ ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে আঙুলগুলো দু কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হলো, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্তানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ- হ্যাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক-কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হলো না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে- কিন্তু কার এমন বুকোট পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াসকিট।

ঠোট দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপব্রূপ রূপ থেকে তাকে বড়ো একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্তানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্ডুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হলো। এ লোকটা ভীমসেনের মতো রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মতো আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হৃদিসের সন্ধানে মগজ আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?’

উত্তর দিল, ‘কোথাও না, পল্টনে ছিলাম, মেসের চার্জে। এক মাস হলো খালাস পেয়েছি।’

‘রাইফেল চালাতে পার?’

একগাল হাসল।

‘কী কী রাঁধতে জানো?’

‘পোলাও, কোরমা, কাবাব, ফালুদা-।’

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ‘ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরি করার কল আছে?’

‘কিসের কল?’

আমি বললুম, ‘তাহলে বরফ আসে কোথেকে?’

বলল, ‘কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।’ বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?’

বলল, ‘না সায়েব, এর অনেক নিচে বড়ো বড়ো গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।’

বুঝলুম, খবর-টবরও রাখে। বললুম, ‘তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রান্ধিরের রান্না আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরে রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ে।’

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—মৃদুমধুর ঠান্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এক পবর্তপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, ‘এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল—একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।’

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে?

আমি বললুম, ‘দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।’

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজনবোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, ‘সায়ের রাতে বাড়িতেই খাবেন।’

খুব বেশি দূর যেতে হলো না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টাঙা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসাবে আমাকে তিনি বেশ দু-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, ‘কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।’

বসকে খুশী করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্থ তাঁরই পাশে বসে ‘উই, সার্ভেন্টমা, এভিডামা, অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্ভেন্টলি, এভিডেন্টলি’, বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলন্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আঁতাৎ হয়েছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্য-নিত্য, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তদ্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল।

তখনরোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারায়ন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে কিছুদিন ধরে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান এককালে মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলাভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্বাথে সেরখানেক দুধার মাংস— তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুগুণে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী-কাবাব। বারকোশ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার ওপরে বসে আছে একটি আস্ত মুরগি-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভয়বাণী দিল— রান্নাঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ’জনের রান্না পরিবেশন করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তখন আর কি করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার ওপর অদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারি কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই-তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, ‘বাস! উৎকৃষ্ট রेंধেছ আবদুর রহমান-।’

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে- পেঁজা বরফের গুঁড়োয় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘এ আবার কি?’

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নিচে আঙুর। মুখে বলল, ‘বাগেবালার বরফি আঙুর- তামাম আফগানিস্তানে মশহুর।’ বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণ এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে-মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজি নেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ-টাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলয়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রঙ্করন্থ পর্যন্ত ঝিনঝিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলি তাই খাইবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, ‘যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।’

কার গোয়াল, কে দেয় ঘুঁয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলি সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম, তৃতীয়, চতুর্থ-কাবুলিরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবশিষ্ট পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, ‘আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।’

‘কে বলল, পছন্দ হয়নি?’

‘তবে ভালো করে খেলেন না কেন?’

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখো দিকিনি- তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর?’

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, ‘কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়।, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরুবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়— আতসবাজির হক্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কি করে।’

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘হজুর কখনো পানশির গিয়েছেন?’

‘সে আবার কোথায়?’

‘উত্তর-আফগানিস্তান। আমার দেশ— সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজি ঘোড়ার সঙ্গে বাজি রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের ওপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

‘শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার ওপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানালার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে পড়ছে, পড়ছে— দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ— কি রকম বরফ পড়ে।’

আমি বললুম, ‘সাত দিন ধরে জানালার কাছে বসে থাকব?’

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণভাবে তাকালো যে, মনে হলো এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, ‘একবার আসুন, জানালার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।’

খেই তুলে নিয়ে বলল, ‘সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনো ঘুরঘটি ঘন,— চাদরের মতো নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,— প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি লাগায়— হু হু করে কখনো একমুখে হয়ে তাজি ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু গুনতে পাবেন সোঁ-ওঁ-ওঁ— তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের ইঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ হাত উঁচু বরফের কম্বল— গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মতো ওম দেয়। তার তলায় মানুষকে দু দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে— সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরকমি ধুলো নেই,

বালু নেই, ময়লা নেই ছুরির মতো ধারাল ঠান্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে— দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে— এক একবার দম ফেলাতে একশটা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

‘তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুধা যদি না খেতে পারেন, তবে আমি আমার গৌফ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।’

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, ‘সে বড়ো খুশি বাৎ হবে হুজুর।’

আমি বললুম, ‘তোমার খুশির জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।’

আবদুর রহমান ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বুঝিয়ে বললুম, ‘তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানালার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?’ □

শব্দার্থ ও টীকা : ও রভোয়া – ফরাসি ভাষার বাক্যবন্ধ। অর্থ : আবার দেখা হবে। নরদানব – মানুষের মতো দেখতে ভয়ঙ্কর জন্তু। এখানে বিশালদেহী মানুষ বোঝানো হয়েছে। আদরার্থে। মর্তমান কলা – মায়ানমারের মার্তাবান দ্বীপে উৎপন্ন কলার জাত। বুজ – গাল রাঙানোর প্রসাধনী। পাঙ্কয়া – চিনির রসে ভেজানো ঘিয়ে ভাজা রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টি। তাগদ – শক্তি। তম্বী – তিরস্কার। বারকোশ – কাঠের তৈরি কানা উঁচু বড় থালা। পুনরপি – পুনরায়। ব্রহ্মরজ্জ – তালুর কেন্দ্রবর্তী ছিদ্র। বপু – বড় দেহ। তনু – ক্ষীণ দেহ। উত্তমার্ধ – স্ত্রী, সহধর্মিণী।

পাঠ-পরিচিতি : ‘প্রবাস বন্ধু’ সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে গ্রন্থের পঞ্চদশ অংশ। প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের ভূমি, পরিবেশ; সেখানকার মানুষ ও তাদের সহজ-সরল জীবনাচরণ, বিচিত্র খাদ্য ইত্যাদি হাস্যরসাত্মকভাবে এই রচনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লেখকের আফগানিস্তান ভ্রমণের আংশিক অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে এখানে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সন্নিহিত খাজামোল্লা নামক গ্রামে বাসের সময় আবদুর রহমান নামের একজন তাঁর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। আফগান আবদুর রহমান চরিত্রের মধ্যে সরলতা, স্বদেশপ্রেম, অতিথিপরায়ণতা ফুটে উঠেছে। আবদুর রহমানের রান্না ও পরিবেশন করা খাবারের মধ্যে আফগানিস্তানের বিচিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যবস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের প্রস্তরভূমি এবং একই সঙ্গে নিকট-প্রতিবেশী এই জনপদের বরফ-শীতল জলবায়ু আকর্ষণীয়। ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পটি আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে; একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভাবতে শেখায়।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

- ১। তোমার এলাকায় শীতকালের যে প্রাকৃতিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তার পরিচয় দাও।
- ২। গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ‘তম্বী’ শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. বড় দেহ | খ. ক্ষীণ দেহ |
| গ. তিরস্কার | ঘ. পুনরায় |

- ২। আবদুর রহমানকে লেখক নরদানব বলেছেন কেন?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ক. আচরণের জন্য | খ. শারীরিক গঠনের জন্য |
| গ. বেশি রান্নার জন্য | ঘ. বেশি খাওয়ার জন্য |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

শীতের ছুটিতে জেরিন সিলেটের জাফলং বেড়াতে যায়। সেখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়ি ঝর্ণা, নদী সবকিছু তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সার্বিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে বাবাকে বলে, ‘এখানে আমাদের একটা বাড়ি বানিয়ে দেবে?’

- ৩। উদ্দীপকের জেরিনের সঙ্গে গল্পের লেখকের চাওয়া একসূত্রে বাঁধা নয়, কারণ লেখক পানশির যেতে চেয়েছিলেন—

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ক. অবকাশ যাপনের জন্য | খ. বিনোদনের জন্য |
| গ. জীবন বাঁচাতে | ঘ. সৌন্দর্য উপভোগের জন্য |

- ৪। উদ্দীপকের জাফলং- এর সঙ্গে ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের পানশিরের বিপরীত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়—

- i. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে
- ii. ঋতু বৈচিত্র্যে
- iii. জীবন যাত্রায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম-পাহাড়

কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।

এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রানি সে-যে আমার জন্মভূমি।

ক. অধ্যক্ষ জিরার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

খ. ‘প্রবাস বন্ধু’ প্রবন্ধে আবদুর রহমানকে ‘নরদানব’ বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমানের চেতনার যে দিকটিকে ধারণ করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “বিষয় বর্ণনায় সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে রয়েছে বিস্তর বৈপরীত্য।” – তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।